জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১

সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ মাঘ ১৪১৮
২৩ জানুয়ারি ২০১২

বাণী

স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) এ চিকিৎসাসেবা এবং জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলোর উন্নয়ন কাজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ’ এ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি যুগোপযোগী করা, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু; পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল নিশ্চিত করা; জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করা; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; মানসম্মত ঔষধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঔষধনীতি যুগোপযোগী করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এইচআইভি/ এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষাসহ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাসহ রোগ নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি।

আমি আশা করি, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে। হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ আরও বেশি উপকৃত হবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রের নিকট জনগণের অন্যতম চাহিদার একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা। স্বাস্থ্য সেবাকে রাষ্ট্রের অন্যতম করণীয় চিহ্নিত করার মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রকৃত জননায়ক হিসেবে মানুষের এ আকাঙ্খাটি বাংলাদেশের সংবিধানে রূপ দান করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অপরিমিত প্রজ্ঞার আলোকে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা এবং গবেষণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে স্থাপন করেছিলেন 'আইপিজিএমআর' যা এখন দেশের একমাত্র চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়'। চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি জেলা, তৎকালীন থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ নেন। কিন্তু ৭৫ এর ঘাতক চক্র ১৫ ই আগস্টের শোকাবহ ঘটনার মাধ্যমে জাতির এ অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন, প্রণীত হয় স্বাস্থ্যনীতি- ২০০০; গ্রামের মানুষের দোর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার অনুসরণে স্থাপন করেন ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ২০০১ সালে পালাবদলের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে বন্ধ করে দেয়া হয় কমিউনিটি ক্লিনিক। স্থগিত হয়ে যায় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন। তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর কার্যক্রম থেমে যায়।

বর্তমানে অনুমোদিত স্বাস্থ্যনীতি হলো- ১৯৯৬ সালের বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যনীতি ২০০০। বিগত সরকার ২০০৬ সালে স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রণয়ন করলেও তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে পারেনি। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের সরকার গঠন করলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত হয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন কমিটি। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় দলমত নির্বিশেষে এ বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিক ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন। এ স্বাস্থ্যনীতির প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে মতামত আহবান, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং স্বাস্থ্যনীতিতে তা প্রতিফলিত করায় নিঃসন্দেহে এটি একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতিতে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে: সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা; রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের নিজ পকেট হতে স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় কমিয়ে আনা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করে জরুরি চিকিৎসাসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশে বর্তমান শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা, ২০২১ সালের প্রতিস্থাপন পর্যায়ে জন উর্বরতা (Replacement level of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্য সেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা, চিকিৎসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ইত্যাদি মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে।

দেশের স্বাস্থ্য খাত ও আপামর জনগণের প্রয়োজনের নিরীখে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং রূপকল্প ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্ণিত প্রস্তাবনার আলোকে এবং সে সংগে সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের উপযোগী স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা, ই-গভর্নেন্স, ই-হেলথ, ই-জন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও টেলিমেডিসিন সেবা গড়ে তোলাই এ স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম প্রয়াস।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি সুসংগঠিত, টেকসই ও সমতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা গড়ে তোলা। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সেইসাথে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ও রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এ স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে আশা করি।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রয়াস ছিল এটিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বা শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় একটি চিরায়ত স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে প্রণয়ন। আমারা আমাদের এ লক্ষ্যে নিবেদিত থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে সর্বপ্রকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে সমুন্নত রেখেছি।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রস্তাবনা

স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্য সেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১), আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলনের অনুচ্ছেদ ১২, শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ২৪, নারীর প্রতি সর্ব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২ এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের রূপকল্প (ভিশন ২০২১) অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্যের সংস্থান, সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করণ, সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীতকরণ, শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে হাজারে ৫৪ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫তে হ্রাসকরণ, মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে ১.৫ শতাংশে হ্রাসকরণ এবং ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি, যথাযথ খাদ্য, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রোগ চিকিৎসা ও কিছু প্রতিরোধমূলক কাজসহ চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সম্পৃক্ততা রয়েছে।

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাধান করে স্বাস্থ্য সেবার বর্তমান অবস্থাকে আরো সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী খাত ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্ম-উদ্দীপিত ও আশান্বিত করার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবায়ণ করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে সরকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এ লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া বিভিন্ন স্তরের জনগণের মাঝে বিশেষত স্বাস্থ্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, বিশেষজ্ঞসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হয়। খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি চূড়ান্ত করার জন্যে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি বিভিন্ন পর্যায় হতে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শসমূহের আলোকে খসড়াটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ চূড়ান্ত করে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-এর উদ্দেশ্য ও নীতি সমূহের আলোকে কর্মকৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হলে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটবে। স্বাধীনতার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে দিন বদলের লক্ষ্যে জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য খাতের গণমুখী উন্নয়ন অর্জিত হবে।

প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অবকাঠামো প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। তবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঔষধ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা, জনবলের অভাব, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা ও প্রশাসনের জটিলতা এবং সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বসবাস করে। ঘনবসতির দিক থেকে যা নগর রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বে সর্বাধিক। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ৪৩ শতাংশ জনগণের বয়স ১৫ বছরের নীচে; প্রতিবছর দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করছে যা দেশের খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ এবং প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সঠিক নীতি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সূচকসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতি হাজারে ছিল ৮২.২, ২০০৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫২-তে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ১১৫.৭। ২০০৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬৫ তে নেমে এসেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিশুমৃত্যু হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ৪ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে মাতৃমৃত্যুর হারও হ্রাস পাচ্ছে। বিএমএসএস জরিপ ২০১০ অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ২০০১ সালের তুলনায় প্রতি লাখে ৩২২ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ১৯৪-তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এই হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রেও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

বিগত বছরগুলোতে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অতীতের প্রবণতা ভেঙ্গে বর্তমানে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা প্রদানের ক্রমবর্ধমান উচ্চহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এখনো সন্তান প্রসবকালে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর অপ্রতুলতা সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে ওজনের স্বল্পতা এবং খর্বতা কমেছে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ (ক্যাপসুল) খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা পুরোটাই অর্জিত হয়েছে। এর ফলে রাতকানা রোগ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পোলিও নির্মূল করা হয়েছে। বাংলাদেশে এইচআইভি-র প্রকোপ অন্য দেশের তুলনায় এখনো অনেক কম। তবে এর বিস্তারের আশংকা রয়েছে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আচরণগত কারণে এক্ষেত্রে ঝুঁকি বিদম্যান ।

গ্রামবাসীর শহর অভিমুখী হওয়া এবং শহরের বস্তিসমূহে অধিক সংখ্যক লোকের বসবাসের ফলে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে যা শহরে স্বাস্থ্য সেবার যথার্থ প্রয়োগকে জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের গরীব মানুষের জন্য এখনও সহজলভ্য নয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা এবং খরা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, যা স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যে স্বাস্থ্য সেবা জনগণ পাচ্ছেন তা পরিসর ও গুণগত মানের দিক থেকে আরও উন্নীত করা প্রয়োজন। বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবার জন্য উচ্চ ফি এবং অধিক রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষাকে ব্যয়বহুল চিকিৎসার একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়েও জনগণ সন্তুষ্ট নয়। জনবলের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকে দরিদ্র, দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানো যাচেছ না।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা জনবলের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন ৫৭টি দেশের একটি। ডাক্তার ও নার্সের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত যেখানে ১:৩ সেখানে বাংলাদেশে সে অনুপাত ১:০.৪৮ যা অনাকাঙ্খিত। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য জনশক্তির স্বীকৃত অনুপাত ১:৩:৫ হলেও আমাদের দেশে চিত্র তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ফলে অদক্ষ সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকেই রোগীদের প্রথম সেবা গ্রহণ করতে হয়। সরকারি বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র জনগণের সার্বিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়। তার উপরে অনেক ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের যোগ্যতাও কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। এর ফলে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীগণ অতৃপ্ত থেকে যায়।

সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসা সামগ্রী এবং উপকরণ সংগ্রহের জটিল ও সময় সাপেক্ষ ক্রয় প্রক্রিয়া বাজেট বরাদ্দের অপরিণত ব্যবহারের অন্যতম কারণ। প্রায়ই অনিয়মিত এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট ও ব্যয় অপ্রতুল।দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে সন্তোষজনক নয়।

স্বাস্থ্য সেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অর্থের সংকুলান ও ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত। বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, যা জিডিপি-র মাত্র এক শতাংশ এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও কম। বর্তমানে সরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবার ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু ৫ ডলার মাত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্য সেবায় মাথাপিছু ৩৪ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুসরণ করে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বছরে অন্তত ২৪ ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

রূপকল্প

স্বাস্থ্য একটি স্বীকৃত মানবাধিকার। সার্বিক জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন দারিদ্র্য নিরসনে অত্যাবশ্যকীয়।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেসমূহ নিম্নরূপ:

১. সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
২. সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।
৩. রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য

প্রথম : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

দ্বিতীয় : জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

তৃতীয় : প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন নিশ্চিত করা।

চতুর্থ : জরুরি চিকিৎসা সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

পঞ্চম : শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ হারকে যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা।

ষষ্ঠ : আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন-উর্বরতা (Replacement level of Fertility) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা।

সপ্তম : মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যথাসম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা।

অষ্টম : অতি দরিদ্র ও অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করা ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

নবম : স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

দশম : চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

একাদশ : সরকারি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন পূর্বক সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

দ্বাদশ : বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের সেবার মান নিশ্চিত করা এবং সেবা ও শিক্ষার ব্যয় জনসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা।

ত্রয়োদশ : সকল চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা ও মেডিকেল টেকনোলজি ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা।

চর্তুদশ : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা।

পঞ্চদশ : রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা এবং এ লক্ষ্যে টিকাদান (Immunization) কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করা।

ষষ্ঠদশ : স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা।

সপ্তদশ : অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজলভ্যতা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

অষ্টদশ : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও রোগ ব্যাধির গতি প্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা।

উনবিংশ : বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত মূলনীতি ও কর্মকৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূলনীতি:

১. জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রা গ্রহণের জন্য আচরণের পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া।

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের যে কোন ভৌগলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়া।

৩. স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত, গরিব, প্রান্তিক, বয়স্ক ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী জনগণের অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান সম্পদের প্রাধিকার, পূর্ণ বণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন, ব্যয়ন, পরিবীক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান পদ্ধতি পর্যালোচনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

৫. সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে

সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহে উচ্চমূল্যের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা।

৬. স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সঠিক ও গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবা দান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা।

৭. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগুলিকে আরো জোরদার ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা।

৮. জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যের সাথে কার্যকর সমন্বয় করা।

৯. পুষ্টি কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করা।

১০. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সকল নাগরিকের অধিকার, সুযোগ, দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে সচেতন করা।

১১. জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা।

১২. স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ও মানসম্পন্ন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহায়ক প্রশিক্ষিত পেশাজীবী কর্মী-বাহিনী গড়ে তোলা।

১৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগ এবং ই-হেলথ ও টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

১৪. অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (Essential Drugs) এর তালিকা হালনাগাদ করা ও সর্বত্র সেগুলোর যথাযথ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। দেশীয় ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫. দুর্যোগ কবলিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের শিকার জনগণের কাছে জরুরি ত্রাণ হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।

১৬. প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতিসমূহ (যেমন- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।

চ্যালেঞ্জসমূহ

স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি সত্ত্বেও অনেক চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা এবং তা ভোগের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। এ সকল বৈষম্য সমষ্টিগতভাবে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে সকল সমস্যাগুলো স্বাস্থ্য খাতের লক্ষ্য সমূহ অর্থাৎ সাধারণভাবে সর্বোচ্চ স্তরের স্বাস্থ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করছে তার মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ধরণেরই সমস্যা রয়েছে। কিছু চ্যালেঞ্জ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

(১) <u>সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে</u>

(ক) দুর্বল ব্যবস্থাপনা (খ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা (গ) সেবার দুর্বল গুণগত মান।

(২) <u>সেবা গ্রহীতার তথা চাহিদার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে</u>

(ক) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থ্যহীনতা (খ) জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

(ক) <u>মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার</u>

যদিও ক্রম হ্রাসমান তবুও প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত এখনও বেশি। প্রজনন-কালীন রুগ্নতা, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী মৃত্যুই এ উচ্চ হারের মূল কারণ। এছাড়া এ উচ্চহারের অন্যান্য প্রধান কারণ হলো: প্রাথমিক এবং মাতৃসেবার অপর্যাপ্ততা,

পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সচেতনতার অভাব, শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অপর্যাপ্ততা।

(খ) শিশুমৃত্যুর হার

শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য সকল কার্যাবলির সফল প্রয়োগ সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যুর মত শিশুমৃত্যুর হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয় (শহরের বস্তি, পাহাড়ি এবং উপকূলবর্তী এলাকা, পরিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চলে তা বেশি)। এর ফলে সরকারি সেবাগুলো সাধারণ জনগণের নিকট সার্বিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হলো: নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিষক্রিয়া এবং আঘাত; এ বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান এবং যথাসময়ে তোলা খাবার প্রদানের প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

(গ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

কতিপয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং বহু ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, গোদ রোগ, কৃমি এবং কালাজ্বর, এইচআইভি/এইডসের হুমকি, জনগণের সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইচআইভি/এইডসের ব্যাপারে যথাযোগ্য নজরদারি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা, একাধিক ঔষধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার জন্য কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কালাজ্বর প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে অগ্রগতি ইত্যাদি উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফাইলেরিয়া এবং মাটি বাহিত কৃমি রোগ বিস্তার প্রতিরোধে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ঘ) অসংক্রামক রোগসমূহ

গতানুগতিক অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রভৃতির প্রকোপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া গতানুগতিক নয় এমন রোগ যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সড়ক-রেল-নৌ দুর্ঘটনা, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য-সমূহ, পানিতে ডোবা, পোড়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সমস্যা ইত্যাদি বর্তমানে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং ফলশ্রুতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শৈশব-কালীন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মেধা উন্নয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(ঙ) নতুন রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব

দেশে প্রায়ই নতুন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার আবির্ভাব ও পুনরাবির্ভাব লক্ষণীয় যেমন: এভিয়ান ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, ডেঙ্গু, নিপা ভাইরাস ইত্যাদি। এ সকল রোগের উপর নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, পানি বাহিত রোগ, পরজীবীবাহিত রোগ যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি এবং পুষ্টি-হীনতা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ।

(ছ) খাদ্য এবং পুষ্টি

পুষ্টি-হীনতা সংক্রান্ত ব্যাধিসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তা-হীনতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার কমেছে। আবার লিঙ্গ বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টি-হীনতার দরুন কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মের হার বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ এবং স্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তস্বল্পতার পরিমাণ ৬০-৮০ শতাংশ।

(জ) নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও বেসরকারি খাতে উচ্চ মূল্যের দরুন শহরের গরিব জনগণ, বিশেষত: বস্তিবাসীরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন আরো বেশি বস্তি, জনবসতি, দুর্বল বাসস্থান, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে যা জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যের মানকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। দ্রুত বর্ধনশীল দরিদ্র নগরবাসীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

(ঝ) গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার উপরে গুরুত্ব দেয়া হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক হবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর। তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেফারেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

(ঞ) জন সংখ্যাতাত্ত্বিক ধরন এবং জীবনযাপন রীতির পরিবর্তন

গত দু’দশকে বাংলাদেশে জন সংখ্যাতাত্ত্বিক ধরন এবং জীবনযাপন পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে। বয়স্ক জনসংখ্যা এবং নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে বাড়ছে রোগব্যাধি এবং মানসিক সমস্যা। জীবনযাত্রার রীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, যেমন– চর্বিযুক্ত খাবার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বিনোদন সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা, তামাকের ব্যবহার, মাদক এবং পানীয়ের প্রতি আসক্তি, বেপরোয়া ড্রাইভিং, সহিংসতা ইত্যাদি এগুলো নগর এলাকার চিত্রকে আমূল বদলে দিচ্ছে। নগরায়নের ফলে পরিবার কাঠামোতে এবং বসবাস ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, যা শিশুদের ও বড়দের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে।

(ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অজ্ঞ ও অদক্ষ লোকের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদের সংখ্যা ও বিশেষত: নার্স ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নূতন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে ও উন্নত দেশসমূহে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জটিল রোগসমূহের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নতুন প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(ঠ) গুণগত মান

প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকা এবং সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর ব্যর্থতা বিশেষত: দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অন্যান্য কারণসমূহ হলো– সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ পত্র ও সেবা প্রদানকারীর স্বল্পতা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(ড) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার এবং এর দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার প্রধান বাধা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কেন্দ্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সকল স্তরে না পৌঁছানোর কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত পালন দীর্ঘায়িত হয়।

(ঢ) স্বাস্থ্য-গবেষণা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কর্মসূচি, সেবা প্রদান ও দরিদ্র-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্বাস্থ্য গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা উত্তম। পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োগধর্মী জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা ব্যবস্থার অভাবের ফলে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিঘ্নিত হয়।

(ণ) তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি ও রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো যথেষ্ট নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিরাজ করছে। রোগ তাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ সামর্থ্য সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে করা হয় না। আচরণগত পরিবীক্ষণের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ই-হেলথ, টেলি মেডিসিন এবং ই-তথ্যের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এখনও হয়নি।

(ত) সমতা ভিত্তিক সেবা

দরিদ্র, সামাজিকভাবে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, প্রান্তিক, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত মানুষ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, বিশেষত: গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী, শিশু এবং বৃদ্ধ এবং সেই সাথে কারখানা শ্রমিকরা সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও কিছু কর্মসূচি তাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারছে না।

কারখানা শ্রমিক, কৃষিখাত, পশুপাখি পালনে নিয়োজিত মানুষ, আদিবাসী, দুর্গম এবং দূরবর্তী এলাকাবাসীদের জন্য এবং নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে, সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(থ) চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতা

যেহেতু প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ, পরিচালন ব্যয় এবং আইনি সহায়তার অভাবে নিয়ন্ত্রক পর্ষদসমূহ যথেষ্ট কার্যকর নয়, তাই চিকিৎসা চর্চা অথবা শিক্ষা এবং গবেষণায় নৈতিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

(দ) জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সংক্রান্ত জ্ঞান

১৫ বছরের উর্ধে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের কম। জনগণ এখনও বিভিন্ন ব্যাধি, স্বাস্থ্য সমস্যা, অপুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। রোগীকে পরামর্শদান (Counselling) আমাদের সমাজে পেশা হিসেবে স্বীকৃত নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনযাপন পদ্ধতিকে আরো স্বাস্থ্যসম্মত ও উৎপাদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে শক্তিশালী উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মকৌশল:

১. সরকার প্রধানের নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন করা হবে। এ কাউন্সিলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-সহ বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডার ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কাউন্সিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হবে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি স্বাস্থ্য নীতি, জনসংখ্যা নীতি ও পুষ্টি নীতির আলোকে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে। তাছাড়া কমিটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, কর্মীদের কর্মজীবন পরিকল্পনা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা নীতিসহ স্বাস্থ্যসেবার সঠিক উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে এবং তা সর্বজনীন করা হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহই হবে প্রধান ভিত্তি। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কর্মকান্ড জোরালো করা হবে এবং স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বে পরিচালিত হবে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। তবে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠীর জন্যও (যেমন- চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা যেতে পারে। দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতর রোগীদের পরবর্তী ধাপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. জরুরি স্বাস্থ্য সেবা জীবন বাঁচাতে পারে বিধায় সার্বজনীন জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। আরোগ্যমূলক ও পুনর্বাসন সেবাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৭. রোগতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরে জরুরি ঔষধ সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

৯. জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন, সহজপ্রাপ্যতা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

১০. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট থাকবে। এগুলোর কর্মকান্ড প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত করা হবে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বিত ভাবে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা কল্পে জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে উত্তম শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হবে। মাতৃ মৃত্যু ও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দিয়ে নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা হবে। নারীদের বিশেষত: গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য যৌনরোগ হতে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো তৈরি করতে হবে।

১২. মাতৃ মৃত্যুর হার ও প্রজনন হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রান্তিক মানুষের কাছে এসব সেবা আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়া হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ও

প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সমন্বিতভাবে দিলে তা জন-বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি কার্যকর ভাবে সমন্বয় করা হবে।

১৩. একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Intergrated Management Information System) এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং-এর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

১৪. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করা হবে।

১৫. স্বাস্থ্য খাতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে।

১৬. বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা হবে। বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীদের সঠিক ও মান সম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি করা ও প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষা- নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৭. স্বাস্থ্য গবেষণার মান ও পরিধি বাড়ানো হবে। এ খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হবে। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি, সামাজিক ও আচরণগত এবং প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দেয়া হবে। বাংলাদেশে যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার পাবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়ানো হবে।

১৮. প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা হবে। সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯. স্বাস্থ্য সেবার পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য অর্থ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্যাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গড়ে বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র এক শতাংশ সরকার স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বরাদ্দ করে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের সাত শতাংশ। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হবে।

২০. স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন একটি সমস্যা। যদিও এ খাতে ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই জনগণ বহন করে, তারপরেও সম্পদের ঘাটতি থেকেই যায়। এটি সমাধানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক (formal) প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিজীবীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর্থিকভাবে দুস্থ লোকদের জন্য দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অভাব রয়েছে। অতি দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত উপায়ে এসব জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে কার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২১. সর্বস্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২২. স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (BMA), বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA), আয়ুর্বেদিক মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইউনানি মেডিকেল এসোসিয়েশন ও হোমিওপ্যাথি মেডিকেল এসোসিয়েশন, নার্সিং এসোসিয়েশন ইত্যাদি পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২৩. সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। দেশব্যাপী তার বিস্তার করা হবে।

২৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের জন্য একটি সঠিক ও চাহিদাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা হবে। চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীর স্বল্পতা ও অসম বণ্টন ব্যবস্থা, দক্ষতা সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা, ন্যায়বিচার ও প্রণোদনার অভাব দূর করার ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলে থাকবে। চাহিদা যাচাই করে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্যারামেডিক

প্রভৃতি) তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল স্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

২৫. চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক ও টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করা হবে এবং গণমুখী ও দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক করা হবে। চিকিৎসা জনশক্তির শিক্ষাদানে সেবার মান, রোগীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, মমত্ববোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

(ক) নার্সিং: ডিপ্লোমা পর্যায়ে দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষায় জোর দেয়া হবে। দেশে গ্রাজুয়েট নার্সদের স্বল্পতা রয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিশেষায়িত নার্সিং শিক্ষা (Specialized Nursing) যেমন- কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, করোনারি কেয়ার ও অন্যান্য বিশেষায়িত ডিসিপ্লিনে নার্সিং শিক্ষা শুরু করা হবে। নার্সিং শিক্ষকদের স্বল্পতাও প্রকট। পোস্ট গ্রাজুয়েট নার্সিং শিক্ষা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুরু করা হবে।

(খ) প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্ট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো হবে। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞানসহ দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হবে।

(গ) ধাত্রী: সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ জনশক্তি দেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) গ্রাজুয়েট পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আরো মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষাদান ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। দেশে প্রচলিত পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও বিভিন্ন কোর্স সমূহকে সমমানের করা হবে এবং সমন্বয় করা হবে। এখানেও আধুনিক প্রযুক্তি ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। চিকিৎসকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশে ও বিদেশে Continuting Medical Education ও প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টার্নিশীপ বিদ্যমান এক বৎসরের পরিবর্তে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দুই বৎসরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্ততঃ এক বৎসর গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা হবে।

২৬. মেডিক্যাল প্রাকটিশনারদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্রাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আরো শক্তিশালী করা হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকেও পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করা হবে। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসি কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিকে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

২৭. সুষ্ঠু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিক্যাল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হবে এবং সেগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

২৮. সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক বা শিক্ষার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন এবং যারা Non-clinical Subject এর শিক্ষক তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্রাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২৯. প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগী পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা তৈরি করা হবে।

৩০. সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য-কর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

৩১. মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সমূহের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে । এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

৩২. সংক্রামক রোগসমূহ যেমন– শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সংক্রামক রোগসমূহের নিরাময়মূলক সেবা জোরদার করা হবে।

৩৩. অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। সমন্বিত উপায়ে সকল পর্যায়ে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান অসংক্রামক রোগগুলো যেমন– ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্সেনিকোসিস সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মাঠ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর বোঝা কমাতে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩৫. টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করে যত সংখ্যক রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করতে হবে।

৩৬. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কুল হেলথ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ জীবন-যাপনের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৭. শিল্প ও কৃষি খাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

৩৮. চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা হবে। এজন্য দক্ষ জনবল তৈরি ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৩৯. বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে দেশে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যাতে ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থল, জল ও বিমান বন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে।